আঁধার রাতের বন্দিনী

আমীরুল ইসলাম

অন্যদিনের মতো আজও গোসল ও খানাপিনা সেরে কিতাবাদি-খাতা-কলম নিয়ে ছাত্রাবাস হতে ক্লাসরুমে প্রবেশ করি। ক্লাস শুরুর আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। ছাত্ররা নিজ নিজ আসনে বসে হুজুরের আগমনের অপথ-পানে অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে। দপ্তরী তৃতীয় তলায় ঝুলান ঘণ্টায় দশটি আঘাত হানার সাথে সাথে প্রথম প্রিয়ডের হুজুর ক্লাসে আসবেন। কিন্তু আজ অন্যদিনের মতো ঘণ্টাটি শোনা গেলোনা। এল পাগলা ঘণ্টার বিপদ ধ্বনি। পাগলা ঘণ্টা শোনার সাথে সাথে ছাত্ররা যার যার কিতাবাদি যথাস্থানে রেখে দিয়ে ছুটল মসজিদপানে। এক এক করে অল্পক্ষণের মধ্যেই মসজিদটি কানায় কানায় ভরে গেলো। এখন কেউ আর রুমে নেই, নেই আঙিনায়।

বড় হুজুর মলিনমুখে মিম্বরের হাতলে হাত রেখে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তার চোখ দুটি লাল, অশ্রুভেজা। তিনি ক্ষীণ আওয়াজে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে বললেন, ;বাবারা! দুরুদ-এস্তেগফার পড়ে খুব বিনয়ের সাথে একাগ্রচিত্তে দোয়ায়ে ইউনুস পাঠ কর। দেশের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ।

আমরা নিয়মানুযায়ী দুরুদ-এস্তেগফার পড়ে গুন গুন শব্দে ‘লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ যোয়ালিমিন’ পড়তে লাগলাম। এক ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর হিসাব করে দেখা গেলো, সোয়া লাখের অধিক পড়া হয়েছে। বড় হুজুর আবার উচ্চস্বরে দুরুদ-এস্তেগফার পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। আমিন, আমিন রবে মসজিদ প্রকম্পিত হয়ে ওঠলো।

দীর্ঘ মুনাজাত শেষে বড় হুজুর মিম্বরে দাড়িয়ে বললেন; হে আমার আজিজ তলাবা ও সহকারী আসাতিজাবৃন্দ! সমরকন্দের জামে মসজিদের খতিবসহ দশ-বারজন

আলেমকে কমিউনিস্টরা ধরে নিয়ে এক জায়গায় বিবস্র করে ব্রাশ ফায়ারে শহিদ করে দিয়েছে।

দীর্ঘ মুনাজাত শেষে বড় হুজুর মিম্বরে দাড়িয়ে বললেন; হে আমার আজিজ তলাবা ও সহকারী আসাতিজাবৃন্দ! সমরকন্দের জামে মসজিদের খতিবসহ দশ-বারজন আলেমকে কমিউনিস্টরা ধরে নিয়ে এক জায়গায় বিবস্র করে ব্রাশ ফায়ারে শহিদ করে দিয়েছে। শুনে শত শত ছাত্রের জবান থেকে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বেরিয়ে এল। হুজুর আরও বললেন, ‘ওরা শহরের বড় বড় বেশ কয়েকটি মাদরাসার উস্তাদ-ছাত্রদের ধরে নিয়ে গেছে। তাদেরকে কোথায় কিভাবে রেখেছে, তার সন্ধান আজও মেলেনি। আমাদের মাদরাসাসহ আরও কয়েকটি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের নামও তালিকাভুক্ত করেছে। কম্বিং অপারেশন চালিয়ে দু-একদিনের মধ্যে আমাদেরকেও ধরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে। থানার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে আমি এ সংবাদ পেয়েছি। তাই আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য

মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করা হল। তোমরা নিজ নিজ দায়িত্বে ছামানাপত্র নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মাদরাসা ত্যাগ কর। দ্বিতীয় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে থাক আর খুব বেশি বেশি দোয়া করতে থাক।

এতটুকু বলতে না বলতে বড় হুজুর অবোধ বালকের ন্যায় হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেললেন। সবার চোখে পানি, সকলের চেহারায় মলিনতার ছাপ। ঠিক এই মুহূর্তে অচেনা এক যুবক জুতা পায়ে পবিত্র মসজিদে ঢুকল। পরনে তার হাফপ্যান্ট, গায়ে হাফশার্ট, বুকে লাগান কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা স্টিকার। মোটা মোটা গোঁফ, চোখ দুটি টকটকে লাল, হাতে হ্যান্ডমাইক। কটিদেশে ঝুলান ইয়া বড় খঞ্জর। দেখলেই মনে হয়, সে যেন নরখাদক-জল্লাদ। মসজিদে প্রবেশ করেই হ্যান্ড মাইকটি অন করে তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলো, 'হে এদেশের আবর্জনা-জঞ্জাল মৌলবাদী ও রূহানীরা! আমাদের চরম ও পরম মুক্তিদাতা লেলিনের আদর্শ গ্রহন কর। তবেই তোমরা পরম সুখে

এদেশে বসবাস করতে পারবে। এখন আর মরুদেশের ধর্ম, মোহাম্মদের ধর্ম এদেশে চলবে না। মিস্টার লেলিন, স্টালিন আর কার্ল মার্কসের মতবাদ, চিন্তা ও আদর্শ ছাড়া অন্যসব মতবাদ অচল। কেউ যদি এর বিরোধিতা কর, তবে তার পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।

যুবকটি এ কথাগুলো বলল সমরকন্দের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ জামিয়া আরাবিয়ার শাহী মসজিদে দাঁড়িয়ে কয়েক ডজন উস্তাদ ও শত শত ছাত্রের সম্মুখে। কেউ মাথা উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে পাপিষ্ঠ যুবকের কথার উত্তর দিতে হিম্মত পেলেন না। হিম্মত হল না প্রতিবাদ জানানোর। তার বক্তৃতার জবাব দেয়ার জন্য আমি অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁড়াতে চাইলাম, কিন্তু পাশের ছাত্রদের বাধার কারণে টা পারলামনা। খুব কষ্ট করেই হজম করতে হল সে দৃশ্য। যুবকটি বিনা বাধায়, বিনা প্রতিরোধে যাকে বলে নিরাপধে মসজিদ ত্যাগ করলো।
ওস্তাদ-ছাত্ররা নিঃশব্দে যার যার রুমের দিকে মন্থর গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো। কারো মুখে হাসি নেই,

ভাষা নেই; আছে শুধু আখি ভরা পানি টলমল। মুহূর্তের মধ্যে কে যেন হৃদয়ের আনন্দ কেড়ে নিয়ে গেলো। নিয়ে গেলো গাল ভরা হাসি আর কিতাব পড়ার গুন গুন রব। মাঝে মধ্যে দু একজন ছাত্র অবুঝ মনকে বুঝ মানাতে ব্যর্থ হয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। একে অপরের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে কি যেন অবলোকন করছিল। সেই করুণ দৃশ্য আমি আজও ভুলতে পারিনি।

সকলেই যার যার রুকে প্রবেশ করে নিজ নিজ কিতাবাদি ও কাঁথা-বালিশ গুছিয়ে গাট্টি তৈরির কাজে ব্যস্ত। আমি সবগুলো রুম ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে ছাত্ররা নিজ নিজ ছামানা কাঁধে বা মাথায় বহন করে চোখের পানিতে আল্বিদা জানিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করল।

আমার সেদিন আর বাড়ী যাওয়ার সুযোগ হল না। কারণ, সমরকন্দ থেকে জামবুল বহু দুরের পথ। রেলগাড়িতেও দু-তিন্দিন সময় লাগে যেতে। তাই পরদিন সকাল সাতটার ট্রেনে যাবার মনস্থির করলাম। দ্বীনের সূর্য

ক্রমশই পশ্চিমাকাশে পালাবার রাস্তা খুজছে। সমস্ত মাদরাসায় আমার মত হতভাগা সাত-আটজন ছাড়া আর কোন ছাত্র নেই। আর আছেন দু-তিনজন ওস্তাদ।

দারে জাদিদের বাগানের কোলঘেঁষে আমি যখন পশ্চিমদিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমার ওস্তাদ জালাল উদ্দিন বুখারি আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আসসালামু আলাইকুম বলে তার পাশে দাঁড়ালাম। ডাকার কারণ জিজ্ঞাসার পরিবর্তে আমার হৃদয়ের গভীর থেকে অবোধ বালকের মতো কান্নার রোল বেরিয়ে এল। হুজুর আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বললেন "বাবা! আল্লাহ জানেন কোন মুহূর্তে কি ঘটে যায়। জানিনা এইটাই জীবনে শেষ মুলাকাত কিনা। ইসলামের এ চরম দুর্দিনে মুসলমানদের বিশেষ করে আলেম-উলামাদের কি অবস্থা হয়? তিনি এক পর্যায়ে নিজেকে সামলাতে না পেরে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। তারপরে আত্মসংবরণ করে বললেন, "গত তিনদিন আগে

বুখারা থেকে বেশ কয়েকজন নামকরা আলেমকে বলেভসিকরা ধরে নিয়ে সাইবেরীয়দের তুসারানঞ্চলে প্রেরণ করেছে। সেখানে শুধু বরফ আর বরফ, জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। তারপর আমার মাথায় তার পবিত্র হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, “বাবা! মাদরাসায় বেশি সময় অবস্থান কর না, বাড়ী ফিরে যাও।’ কিতাবাদি যতটুকু পড়া হয়েছে, তা মুতাআলাকর। আর আল্লাহ্‌র নিকট বেশি বেশি দোয়া করতে থাক।

এই উপদেশগুলো দিয়ে তিনি তার রুমে চলে গেলেন। আমি আবার পুর্বের ন্যায় প্রতিটি রুম ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম। হায়! যেখানে সকাল সন্ধ্যা, ভোর-বিহানে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতের গুন গুন রবে জামিয়ার আকাশ-বাতাস মুখরিত থাকত, রুমে রুমে চলত বিভিন্ন বিষয়ের কিতাবাদির তাকরার, সেখানে আজ বিরাজ করছে নিরবতা, নিস্তব্ধতা ও খা খা পরিবেশ। মসজিদ-মাদরাসার আকাশচুম্বি ইমারাতগুলো যেন স্বজনহারানোর বেদনায় আর্তনাদ করছে। এমন এক করুণ দৃশ্য

অবলোকন করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, যা আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তাই আমিও রুমাল অশ্রুসিক্ত করতে করতে নিজ কক্ষে ফিরে এলাম। এমনি এক অবর্ণনীয় বেদনা বক্ষে ধারণ করে ছটফট করে রজনী পোহালাম।

ফজরের নামাজ আদায় করে রুমে গিয়ে ছামানাপত্র গুছিয়ে টাঙ্গায় চড়ে সকাল সাতটা বাজার বিশ মিনিট আগেই রেল ষ্টেশনে পৌঁছলাম। মাদরাসা থেকে বেরিয়ে আসা আমার জীবনের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। অশ্রুসজল নয়নে মাদরাসার দিকে তাকিয়ে শেষবারের মত নেত্রযুগলের তপ্ত অশ্রু উপহার দিয়ে বেরিয়ে আসলাম। ষ্টেশনে এসে জামবুলের টিকিট সংগ্রহ করে ট্রেনের অপেক্ষায় একটি বেঞ্চে বসলাম। অন্যদিনের মতো ষ্টেশনে তেমন লোকজন নেই। কেমন যেন একটা নিরবতা-নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ট্রেন সকাল সাতটায় ষ্টেশনে আসার কথা থাকলেও দু'ঘণ্টা বিলম্বে এসে দাঁড়াল। আমি আমার ছামানাপত্র নিয়ে একটা সীট দখল

করে বসলাম। আমার পাশের সীটে দু'তিনজন হুজুর উপবিষ্ট। সামনের সীটে কয়েকজন যুবক বসে সিগারেট টানছে। মাত্র কয়েক মিনিট পর গার্ড বাঁশি বাজিয়ে সবুজ নিশান নাড়তে লাগলো। গাড়িটি প্রলয় শিঙা ফুকিয়ে সবগুলো চাকা সচল করে একযোগে গড়িয়ে গড়িয়ে চিরচেনা পথে সামনে এগিয়ে চলল। বন-বাদার, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ট্রেন একটি ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল।

ট্রেনটি দাঁড়ানোর সাথে সাথে কমিউনিস্ট যুবকরা প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট এ গিয়ে তল্লাশি চালায়। দাড়ি-তুপিওয়ালা হুজুর বা মাদরাসার ছাত্র পেলে ধরে নিয়ে যায়। সারাটা ট্রেনে এক আতংক বিরাজ করছিল। ট্রেনটি প্রতিটি ষ্টেশনে ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট করে বিলম্ব করছে। আমার সামনের সীটের বখাটে যুবকেরা আমার পাশের হুজুরদেরকে মৌলবাদী-রূহানী শব্দ প্রয়োগ করে ব্যাঙ্গ করতে লাগলো। কেউ বলছে, ও মোল্লা! এত বড় দাড়ি দিয়ে কি কর? দাঁড়ির সেবাযত্ন করতে যে তেল লাগে, তা কোথায় পাও? 'আবার কেউ বলছে, "বাপরে বাপ, এত

বড় জামা! মোল্লারাই কাপড়ের দর বাড়াচ্ছে।" এ ধরের নানা উপহাসমূলক কথা ও অট্টহাসিতে কম্পার্টমেন্ট প্রকম্পিত।

আমি হুজুরদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথায় যাবেন? হুজুর উত্তর দিলেন, ছামারগান।

ছামারগান এখনো বহুদূর। সবটুকু পথ পাড়ি দেয়া দুরূহ। তাই হুজুরগণ পরস্পর পরামর্শ করে সামনের ষ্টেশনে নেমে অন্য উপায়ে বা পদব্রজে বাকি পথ অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা আমাকেও পরামর্শ দিলেন, বাবা! অবস্থা খুব সঙ্গিন, তুমিও রেলপথে না গিয়ে অন্য পথ তালাশ কর। আমি উত্তর দিলাম, হুজুর, তাকদিরে যা আছে, তাই হবে, এর বেশি কিছু নয়। এসব আলাপ করতে করতে ট্রেনটি উলিশিয়ান ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। সাথে সাথে হুজুরগণ ঝটপট ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে একাকি বসে রইলাম। রাত এগারটা। পেতে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করে

জ্বলছে। ক্ষুধার তাড়না সইতে না পেরে একপা-দু পা করে কম্পার্টমেন্ট এর পর কম্পার্টমেন্ট পার হয়ে ক্যান্টিনে গেলাম। আমি মেসিয়ার থেকে খাবার এবং কোনটার দাম কত জেনে নিলাম। তারপরে হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসলাম। মেসিয়ার এসে কি খাব জিজ্ঞাসা করলো। আমি বললাম ভাই, আমি তো মুসাফির, যেতে হবে বহুদূর, অর্থকড়িও তেমন নেই। কাজেই অল্প পয়সার মধ্যে সামান্য কিছু খানা দাও।

মেসিয়ার চার আনা দামের দুটি রুটি আর চার আনা দামের একটি গোস্তের কাবাব, মোট আট আনার খাবার পরিবেশন করল। আমি বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ বলে খেতে লাগলাম। এগুলো খেতে না খেতে মেসিয়ার আরও কিছু খাবার এনে বলল, "এসব খাবারও আপনার জন্য, এগুলোও খেয়ে নিন।" আমি বললাম, না ভাই, আমার কাছে এতো পয়সা হবে না। মেসিয়ার বলল, "আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। আপনার পাশে যে ভদ্রলোকটি বসে খানা খাচ্ছিলেন উনি

পয়সা পরিশোধ করে দিয়ে বলে গেছেন আপনাকে এসব দিতে।”

আমি অনেক ভেবে-চিনতে সবগুলো খানা খেয়ে নিলাম। খানা খেয়ে কম্পার্টমেন্টে আসার পথে এক ভদ্রলোক আমাকে ডাকলেন। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, খাবার গাড়ীর সেই ভদ্রলোক। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে সালাম-মুসাফাহা করে জিজ্ঞেস করলাম, জনাব! আমাকে ডাকছেন কেন? ভদ্রলোকটি তার স্নেহমাখা হাতটি আমার মাথায় বুলিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! তুমি কোথায় যাবে?
বললাম, জামবুল।
তোমার সাথে আর কেউ আছেন?
বললাম, কেউ নেই, আমি একা।
বাবা! জামবুল তো বহুদূর। দু'তিনদিনের পথ। কোথা থেকে এলে?
বললাম, সমরকন্দ থেকে।
সেখানে কি কর তুমি?

বললাম, লেখাপড়া করি। এতসব প্রশ্ন করার পরও ভদ্রলোক আরও কিছু জানতে চাইলেন। আমি এক এক করে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। এক পর্যায়ে ভদ্রলোক কাতর স্বরে বললেন, 'বাবা! দেশের অবস্থা খুবই নাজুক। আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, দ্বীনদার-পরহেজগার ও মাদরাসার ছাত্রদের উপর চলছে বলভেসিকদের জুলুম-নির্যাতন। তুমি একা এতদূর পথ কি করে যাবে? তুমি যে তালেবে এলেম, তা তোমার নূরানি চেহারাই প্রমাণ করছে। এই বলে তিনি তার ব্যাগ থেকে একটি শার্ট আর একটি প্যান্ট বের করে আমাকে বললেন, যাও, তোমার পোশাক পাল্টে এগুলো পরে নাও। তাহলে কেউ তোমাকে মাদরাসার ছাত্র বলে সহজে চিনবে না।

সুন্নতি পোশাক শরীর হতে আলাদা করা আমার পক্ষে ছিল বেদনাদায়ক। তবু মুরুব্বী মানুষ বারবার পীড়াপীড়ি করায় পোশাক পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। টয়লেটে গিয়ে পোশাক পাল্টিয়ে আসলে ভদ্রলোকটি কাস্তে-হাতুড়ি

মার্কা একটি স্টিকার আমার বুকের পকেটে পিন দিয়ে এঁটে দিলেন। অতঃপর কিছু উপদেশ দিয়ে বললেন, আমি কাজাকিস্থান পর্যন্ত যাবো। কোন অসুবিধা হলে আমাকে জানাবে। আর খাওয়া-দাওয়া আমার সাথে করবে। খাওয়ার সময় আমার এখানে চলে আসবে।

ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ি। বিপদে এমন বন্ধু ক'জনের ভাগ্যে জুটে? তাই আল্লাহ্র প্রশংসা করতে করতে আমার কম্পার্টমেন্টের সীটে এসে বসলাম। দু'পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

ফজরের ওয়াক্ত। গাড়ী আশেকাবাদ ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। টিটির কাছ থেকে জানতে পারলাম, এখানে মাল ওঠানামা হবে। গাড়ী ছাড়তে দেড়-দু'ঘণ্টা বিলম্ব করবে। এ সুবাধে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে নেয়া যায়। তাই ট্রেন থেকে নেমে রেলওয়ে জামে মসজিদের দিকে চললাম। মসজিদে গিয়ে দু'চারজন মুসল্লী ছাড়া আর কোন লোক আশেপাশে

দৃষ্টি গোচর হল না। ইমাম-মুয়াজ্জিনেরও কোন হদিস নেই।

আজান হয়েছে কিনা, এক মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করায় তিনি চুপি চুপি বললেন, ‘আজ দুদিন হল এ মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে কমিউনিস্টরা শহিদ করে দিয়েছে। ঘাতকরা লেলিনের প্রাইভেট গুন্ডাবাহিনী। শহিদের তাজা খুনে এখনো মসজিদ সিক্ত। আজান, ইকামাত, জামাত সবই বন্ধ হয়ে গেছে। মুসল্লীরাও আসে না। অগত্যা আমি নিজেই আজান দিয়ে বারান্দায় সুন্নত পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার দেখাদেখি আরও তিন-চারজন মুসল্লী এলো। তারপর জামাতের সাথেই দু’রাকাত ফরজ আদায় করলাম।

মোনাজাত সেরে মসজিদের গেটে আসার সাথে সাথে গোঁফওয়ালা এক যুবক চোখ দু’টো কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলো, “আজান কে দিয়েছে? নামাজ কে পড়াচ্ছে? কার এতো বড় বুকের পাটা? কে সে ব্যক্তি? মাত্র দুদিন হল এ

মসজিদ থেকে দু'জন মৌলবাদী রূহানী শয়তানকে পশুর মতো জবাই করে বেহুদা কাজ থেকে ঘরটি মুক্ত করেছি। আবার কোত্থেকে অবাঞ্ছিত হতভাগা এসে উচ্চস্বরে আজান নামক শব্দগুলো শুনাল? সে কি জানে না, দু'দিন পর মসজিদ নামক ঘরটিকে আমরা ক্লাব বানাব! এখানে আমোদ-প্রমোদ হবে, এখানে চলবে নাচ-গান, বসবে পানশালাও মদের আসর।"

যুবকের অকথ্য বকাবকি আমার বুকে অস্থিরতার অনল প্রজ্বলিত করে দিল! নির্বাক আননে বিষবাক্য এনে দিল। ঘুমন্ত সিংহ শাবকের গায় অসির খোঁচা হানল। আগপাছ চিন্তা করার সামান্যতম ফুরসত না পেয়ে আমি ব্যাঘ্রের হুংকার ছেড়ে বললাম, "হে পাপিষ্ঠ নরাধম! আমাদের পবিত্র মসজিদ শহীদের খুনে লাল করে দিয়ে ক্লাব আর মদ্যশালায় রূপান্তরিত করবে? নর্তকীদের আড্ডাখানা বানাবে? মদপান করে নাচ-গান করবে? আর মুসলমানরা শুধু গ্যালারীর দর্শক সেজে নিরবে সয়ে যাবে? তা কখনো সম্ভব নয়।"

কথাগুলো বলতে না বলতে আমার উপর নেমে এল কমিউনিস্ট হায়েনাদের অসহনীয় নির্যাতন। মুহূর্তের মধ্যে আমি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখি আমি হাসপাতালের বেডে শায়িত। কে বা কারা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছেম তা জানি না। আমার পাশে ডাক্তার ও কয়েকজন লোক দাঁড়ান। রক্তে জামা-কাপড় ভিজে আছে। মাথায় ও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কে যেন হাত দিয়ে তুলির সাহায্যে রক্তগুলো মুছে দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি ট্রেনের সেই ভদ্রলোক। একটু পরে কয়েকজন ধরাধরি করে আমাকে নিয়ে গেল ট্রেনে। শুইয়ে দিল ঐ ভদ্রলোকটির সীটে। তিনি আমার একপাশে বসে আমাকে ধরে রাখলেন। গাড়ী তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল।

আমি আমার অবস্থা জানতে চাইলে ভদ্রলোকটি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "ট্রেন ছাড়ার বেশি দেরি দেখে নাস্তা করার জন্য আমি মসজিদ মার্কেটের মুসলিম হোটেলে যাচ্ছিলাম। মসজিদের প্রধান ফটকে লোকজনের

ভিড় আর হৈচৈ শুনে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় তুমি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছো। লোকমুখে শুনতে পেলাম, বলভেসিকরা তোমাকে আজান দেয়ার অপরাধে মারধর করে চলে গেছে। আমি চার-পাঁচজন লোক নিয়ে চিকিৎসার জন্য তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। বেশকিছু টাকার বিনিময়ে ডাক্তারগণ ক্ষতস্থান সেলাই করে, ব্যান্ডেজ বেঁধে ভালো চিকিৎসা দান করেন। তারপর তোমার জ্ঞান ফিরে আসে।" ভদ্রলোকটি পিতৃসুলভ সান্ত্বনা দিয়ে আমার মনোবল চাঙ্গা করেন। কাজাকিস্থান পৌছা পর্যন্ত তিনি আমার পরিচর্যা করেন।

ট্রেনটি কমিউনিস্টদের অনেক অত্যাচার সয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে একদিন বিলম্বে কাজাকিস্তানে এসে পৌঁছল। ট্রেনটি ষ্টেশনে পৌঁছার কিছু আগেই ভদ্রলোকটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমাকে বললেন, " বাবা! আমার তো হায়াত ফুরিয়ে গেছে। এখানে আমি নেমে যাব। তুমি কোন চিন্তা কর না, স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাতে তোমাকে সোপর্দ করে যাচ্ছি। মনভরা ব্যথা নিয়ে বিদায়

নিচ্ছি। আল্লাহ হয়তো আবার দেখা করাতে পারেন। ডাক্তারের দেয়া ওষুধগুলো নিয়মিত খেয়ে যাবে। আপাদত বিশ্রামে থেকো, কোন শক্ত কাজ কর না। অল্প দিনে ইনশা আল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে। তারপর তিনি বেশ কিছু ফল, রুটি, পানি ও কিছু টাকা দিয়ে বললেন, “সময়মত খাবার খাবে, প্রয়োজনে এ অর্থ খরচ করবে। যাই বাবা। আল্লাহ হাফেয।’

দুপুর সোয়া বারটায় ট্রেনটি আমাকে নিয়ে কাজাকিস্তানের রাজধানী আলমাআতা অভিমুখে ছুটল। মাঠঘাট, বনবাদাড়, সেতু, কালভার্ট পাড়ি দিয়ে প্রায় পাঁচ দিনে আলমাআতা হয়ে আম্রার নিজ গ্রাম জামবুল এসে থামল। ষ্টেশন থেকে আমার বাড়ী তিন ক্রোশ দূরে। টাংগা দিয়ে যেতে হয়। কুলির সাহায্যে লাগেজপত্র ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে এলাম। টাংগা ছুটছে ঠক ঠক ঠক করে। বহুদিন পর বাড়ী যাচ্ছি। এক অনাবিল শান্তিতে হৃদয় মন পুলকিত। আম্মু হয়তো আমার আগমনের প্রতিক্ষায় পথপানে চেয়ে আছেন। হয়তো অনেক জিনিষ নিজে না খেয়ে আমার

জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। হয়তো আমাকে দেখার অভিলাষে প্রহরের পর প্রহর অঘুম নয়নে এন্তেজার করছেন। দেশের নাজুক পরিস্থিতির কারণে হয়তো জায়নামাজে বসে দোয়া করছেন।

আমি এসব চিন্তা করতে করতে কখন যে বাড়ির নিকট এসে গেলাম, তা ভাবতেও পারিনি। টাঙ্গাওয়ালা বললেন, 'বাবা! তুমি বাড়ী এসে গেছো, জলদি নাম।' একা একা খুব কষ্ট অনুভব করছিলাম। তাই টাঙ্গাওয়ালা বাড়ী পর্যন্ত আমার লাগেজপত্র পৌঁছে দিলো। আমি বাড়িতে প্রবেশ করলাম। আমার সালামের শব্দ শুনে আম্মু একরকম দৌড়ে কাছে এলেন। রক্তমাখা কাপড়চোপড় আর মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমি আম্মুকে অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিলাম ও ধর্যধরতে বললাম। আম্মু আমাকে আলতোভাবে তার নরম বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

আম্মু এক এক করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জানতে চাইলেন। আমিও শান্তভাবে আমার অবস্থা, মাদরাসার হালত ও তাসখন্দ, সমরকন্দ, বুখারা, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করলাম। আমিই মায়ের একামাত্র আদরের সন্তান। আমার এক ভাই এক বোন পাঁচ বছর আগে মারা যায়। এখন আমিই বাবা-মায়ের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র স্বপ্ন। তাই আমি তাদের সবগুলো ভালোবাসার একচছত্র উত্তরাধিকারী। এ ভালোবাসার মধ্যে অন্য কোন শরীক নেই। দুঃখ-কষ্ট কি জিনিষ, তা অনুভব করার সুযোগ আমার হয়নি কোনদিন।

দাদা আমিরজান বাগদাদী ছিলেন সে যুগের বড় আলেম। তিনি বাগদাদের ঐতিহ্যবাহী নেজামিয়ায় অধ্যয়ন করেন। তিনি কয়েকটি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পবিত্র কুরআন-হাদীস ছাড়াও এলমে ফেকাহ, এলমে মানতেক, এলমে ফাছাহাত, এলমে বালাগাত ও এলমে তাসাউফে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বহুদিন অধ্যাপনার

কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সমাজ সেবায় তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। চারদিকে বইত তার সুনামের ঢেউ।

তিনি ছিলেন হযরত জালাল গোরখী রহঃ এর মুরিদ। নকশেবন্দী তরীকায় তিনি অনেক রিয়াজত-মুজাহাদা করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মারেফাতের ময়দানেই বিচরণ করেন। হযরত জালাল গোরখী রহঃ তাকে খেলাফত প্রদান করে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মসজিদ-মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তার অলৌকিক বহু ঘটনাবলী এখনো লোকমুখে শোনা যায়।

অনেক দিন সফর করে তিনি জামবুলে আসেন। এখানে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। অনেকেই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এখনো জামবুলের মানুষ ধর্মানুরাগী। জামবুলের শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-কালচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিবেচনা করে বাগদাদ

থেকে হিজরত করে জামবুলে আসেন। জামবুলকেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার উপযুক্ত স্থান মনে করেন।

এখানে তিনি কারুকার্যখচিত একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। তারই পাশে প্রতিষ্ঠা করেন বাগদাদের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায়ে নিজামিয়ার অনুকরণে বিশাল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মসজিদটির সামান্য দক্ষিণে খনন করেন একটি বিশাল দীঘি। এই দীঘিকে কেন্দ্র করেই খানকা, হেফজখানা ও মেহমানখানা তৈরি করেন। তারই অদূরে চার ফুট উঁচু দেয়ালবেষ্টিত বিরাট এলাকা নিয়ে স্থাপন করেন মানুষের আখেরি বাসস্থান। দাদা আমিরজান নকশবন্দী এখন ঐ গোরস্থানেই শায়িত। তিনি রেখে গেছেন অনেক শাগরেদ, মুরিদ, ভক্ত ও গুণগ্রাহী।

আমার পিতা ইউসুফ জামবুলি শহীদ রহঃ মাধ্যমিক শিক্ষা দাদাজানের কাছে শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ, সমরকন্দ ও বুখারার বড় বড় মাদরাসা থেকে একেক বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করেন। আধ্যাত্মিক বিষয়াদি

দাদাজানের সান্নিধ্যে থেকেই চর্চা করেন। তারপরে দাদাজানের পরামর্শক্রমে কাজাকিস্তানের রাজধানী আলমাআতা জামেউল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিম্মাদার হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আমি আট বছর বয়সে আব্বাজানের নিকট পবিত্র কুরআন হেফয শেষ করে সমরকন্দ জামিয়া আরাবিয়ায় ভর্তি হয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করতে থাকি। সেখানে আট বছর লেখাপড়া করে জালালাইন জামাতে উত্তীর্ণ হই। বয়স আঠার। দাড়ি-গোঁফ এখনো গজায়নি। সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছি। জীবনের স্বপ্ন আলেম হব। দেশের জন্য, জাতির জন্য গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করবো। কমিনিজমের অগ্রযাত্রা পদানত করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবো। তাছাড়া আরও লক্ষ আশা বুকে লালন করে আসছিলাম। আমার সহস্র আশা আজ মুকুলেই ঝরে পড়ার উপক্রম।

আম্মুর বিছানায় কেটে গেলো বারটি দিন। এ সময়ে বাহির জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কোন বার্তা কর্ণকুহুরে প্রবেশ করেনি। এমন বদ্ধঘরে জীবনে আর

কোনদিন আবদ্ধ হইনি। এতদিনে শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েছে। ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেছে প্রায়। বিষ-ব্যদনা তেমন অনুভূত হচ্ছে না। তাই বাড়ির চার দেয়ালের ভিতরেই একটু হাঁটাহাঁটি করি। বিকেলবেলা বাড়ির বাহিরে যেতে চেয়েছি কয়েকদিন। কিন্তু আম্মু যেতে দেননি কমিউনিস্টদের ভয়ে।

এদিকে গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে কোন লোকজন যাতায়াত করছে না। তাই আব্বুর কোন খবরাখবর পাচ্ছি না। আম্মু আব্বুর আগমনের পথপানে চেয়ে থাকেন। একদিন গভীর রাতে আম্মু চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে ওঠে বসলেন। আম্মুর চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে আম্মু? কাঁদছেন কেন? তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, “আমি একটি অশুভ স্বপ্ন দেখেছি বাবা। জানি না, তোমার আব্বা কেমন আছেন, কি তার অবস্থা। স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথার উড়নি প্রচণ্ড ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

শুনে আমি আম্মুকে মিছামিছি সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। আম্মু কিছুটা শান্ত হয়ে আমাকে ঘুমিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে আবার ভেসে আসলো তার কান্নার আওয়াজ। আমি আবার তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা! জানি না তোমার আব্বার কি অবস্থা। মনে হয় আমাদের ফেলে তিনি পরপারে বিদায় নিয়েছেন। হয়তো হায়েনারা তোমার আব্বাকে শহীদ করে ফেলেছে। আমার শরীর কাঁপছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, ঠোঁট শুকিয়ে আসছে।' তারপর তিনি আমার কথা, দেশের কথা ও দ্বীনের চিন্তা করতে লাগলেন। এর মধ্য দিয়ে কেটে গেলো রজনী।

রাতের পাখীরা পালক ঝেড়ে উড়তে লাগলো। মোরগ ডাকছে, বুলবুলিরা গান ধরেছে, পুর্বগগন ক্রমশই রাঙ্গা হয়ে ওঠছে। মুয়াজ্জিন আগের মতো আজান দিচ্ছে না। আজানের শব্দ শুনলেই কমিউনিস্ট হায়েনারা মুয়াজ্জিনকে প্রহার করে। তাই প্রায় এক মাস যাবত কাজাকিস্তানের

আকাশ-বাতাস আজানের মধুর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে না। আমরা মা-বেটা অজু-এস্তেঞ্জা সেরে নামাজ আদায় করলাম। নিজ গৃহে বন্দী অবস্থায় কেটে গেলো অনেকদিন।

আব্বাজানের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আমি অনুমতি চাইলে আম্মু রাজি হলেন। আগামীকাল খুব ভোরে আলমাআতা যাওয়ার চূড়ান্ত ফায়সালা হল। আমি আম্মুকে বললাম, কাল ভোরে আব্বাজানের নিকট আলমাআতা অবশ্যই যাবো। আজ দেশের হালচাল জানার জন্য জামবুল শহর থেকে একটু ঘুরে আসি। আমার কথায় আম্মু রাজি হলেন। নাস্তা-পানি খেয়ে টাঙ্গা চড়ে জামবুল গেলাম। শহরের অলিগলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় নেই, নেই কোন কোলাহল। হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট ফাকা। মনে হল, এ যেন এক ভূতুরে নগরী। এ দৃশ্য আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল। বেশি সময় শহরে কাটান সমীচীন মনে করলাম না। তাই বাড়ী ফিরছি বুক ভরা ব্যথা নিয়ে।

সামান্য পথ অতিক্রম করতেই খারকানী চাচার সাথে দেখা। তিনি আমাদের পাশের মহল্লার একজন গাধা ব্যবসায়ী। তিনি এক শহর থেকে গাধা খরিদ করে অন্য শহরে বিক্রি করতে যান। গাধার পাল নিয়ে প্রায় আলমাআতা যেতেন। তাই তার কাছ থেকে আব্বাজানের কথা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, বাবা! সেখানে খুব গরম অবস্থা। কমিউনিস্টরা বহু আলেম-ওলামাকে ধরে নিয়ে গেছে। কাউকে গরম তেলে, কাউকে আগুনে জ্বালিয়ে, কাউকে হাত-পা বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে, আবার কাউকে ফাসিতে ঝুলিয়ে, কাউকে রাস্তার পাশে বড় গাছে পেরেক মেরে শহীদ করে দিচ্ছে। বেশ কিছু দ্বীনদার-পরহেজগার মানুষকে ধরে নিয়ে গেছে সাইবেরিয়ায়। জ্বালিয়ে দিয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি। লুটে নিয়েছে মুসলমানদের দোকানপাট। যে সমস্ত মুসলমান লেলিনের আদর্শ গ্রহণ করেছে, তারা সবাই বহাল তবিয়তে আছে। শুনেছি, তারা হায়েনার মতো মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে।

চাচার কথা শুনে আম্মুর স্বপ্নের কথা মনে হল। আমার শরীর কাঁপছে, শক্তি-সাহস লোপ পাওয়ার উপক্রম। চাচার কথায় আমার একিন হয়ে গেলো যে, আব্বাজানকে ওরা নিশ্চয় শহীদ করে দিয়েছে। কারণ, কাজাকিস্তানের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ জামিউল উলুম একটি মার্কাজে দ্বীন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপরিচালক আল্লামা ইউসুফ জামবুলীকে ছেড়ে দিবে, তা হতে পারে না। নিশ্চয় ওরা তাকে শহীদ করে দিয়েছে। বাড়ী গিয়ে আম্মুকে এ সংবাদ শোনালে হয়তো আমাকে আব্বুর খোঁজে যেতে দিবে না। তাই বাড়িতে গিয়ে এসব কিছুই শুনাইনি। বরং বলেছি, আলমাআতা যেতে পারবো। কোন অসুবিধা হবে না। খবর মোটামোটি ভালো।

১৯২৯ সাল। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ। ভোরবেলা আম্মুর সাথে নাস্তা খেয়ে আব্বুর খোঁজে আলমাআতার উদ্দেশ্যে জামবুল ত্যাগ করব। আম্মু বারবার আমার দিকে তাকিয়ে অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে ক্ষীণ আওয়াজে বলছিলেন, “বাব! তোমার আব্বুকে হয়তোবা পাবে না।

আমি তোমাকেও হারাতে বসলাম কিনা কে জানে!” আম্মুর বয়স ষাটের কোঠায়। স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়। শরীর খুবই দুর্বল। বৃদ্ধা জননীর হৃদয়বিদারক কথাগুলো আমার হৃদয়ে খুব আঘাত হানল। আমার আখি যুগলের কোন বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অশ্রুধারা।

আমরা উভয়ে কান্না সামলিয়ে নিলাম। আম্মু পথ খরচের জন্য আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, “বাবা! এগুলো প্রয়োজনে খরচ কর। ইসলামের ভাগ্য আকাশে কালো মেঘ পরলক্ষিত হচ্ছে। এ ঘনঘটা ও অমানিশা কখন ঘুচবে, তা একমাত্র আল্লাহ জানেন। বাবা! দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য, মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচানোর জন্য, বঞ্চিতদের অধিকার ছিনিয়ে আনার জন্য তোমাকেই এগিয়ে আসতে হবে। তোমাকেই হতে হবে ইসলামের নির্ভীক সিপাহসালার। অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার চেয়ে কাফের, বেঈমান, নাস্তিক, মুর্তাদদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করে, ওদের ক্ষতম করে শাহাদাতবরন করা অধিক শ্রেয়। বাবা! তোমার মা শুধু আমি একজন নই।

আমার বয়সী সকল মুসলমান মহিলাই তোমার মায়ের সমান। তাদের ইজ্জত রক্ষা করা তোমার উপর ফরজ। আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ এতো সস্তায় জীবন বিকাবে, তা হতে পারে না। তোমাকে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। তুমি তোমার আব্বার খবর নিয়ে জলদী এসো। শুনেছি, তুর্কমেনিস্তানে আনোয়ার পাশা যুবকদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেছেন। কিছু কিছু যুদ্ধও নাকি করছেন। তিনি নাকি জিহাদ করা বর্তমান সময়ে ফরজে আইন ফতোয়া দিয়েছেন। তার বাহিনী নাকি তাসখন্দ, সমরকন্দ ও বোখারায় জিহাদ করছে। তোমাকেও আমি আনোয়ার পাশার নিকট পাঠাব। তুমি তার দলে ভর্তি হয়ে জিহাদ করবে। মসজিদ-মাদরাসা, আলেম-ওলামা ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করবে।'

আমি কান পেতে আম্মুর কথাগুলো শুনছিলাম। চোখে-মুখে তার প্রতিশোধের আগুন। বুকে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা। মুখে বিরঙ্গনা খানছা রাঃ এর বাণী। আমার

মনে হচ্ছিল, এ যেন বর্তমান জমানার খাওলা, ছুমাইয়া, উম্মে জিয়াদ, উম্মে আম্মারা ও আম্মা আয়েশা ছিদ্দিকা রাঃ। তার তেজোদীপ্ত ভাষণ আমার নিকট অমৃত সুধার মতো লাগছিল। আমি আম্মুকে বললাম, এই তো সেদিন ওলামায়ে কেরাম আনোয়ার পাশার বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখে বোখারার অলিতে-গলিতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তাকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাকে কোন ধরণের সাহায্য সহযোগিতা না করা, আশ্রয় না দেয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে আহবান জানিয়েছেন। আম্মু আমার কথা শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ভ্রু-কুঞ্চিত করে বললেন, “মাখলুকের ফতোয়ার দরকার নেই। আল্লাহ নিজেই মুফতি হয়ে ফতোয়া প্রদান করেছেন জিহাদ করার জন্য।”

আম্মার কথাগুলো আমাকে দিয়েছে নতুন দিগন্তের সন্ধান। আমি আম্মুর আঁচল আঁকড়িয়ে ধরে শপথ নিয়েছি, প্রতিজ্ঞা করেছি, বেঈমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবো। আম্মু আমাকে বিদায় দিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ

করলেন। আমিও সালাম জানিয়ে আলমাআতার দিকে পা বাড়ালাম। আম্মু আবার পেছন দিক থেকে ডেকে বললেন, বাব! যথাসম্ভব বড় বড় রাস্তায় না গিয়ে সাধারণ রাস্তায় যেও। গ্রাম্যপথ অনেকটা নিরাপদ। এটাই তোমার জন্য আমার আখিরী নসিহত। আমি জামবুল শহরে গিয়ে দেখি, ট্রেন চলাচল বন্ধ। টাংগা ছাড়া আর কোন বাহন নেই। অনেক দুরের পথ। একটানা যাওয়া যাবে না। বদলিয়ে বদলিয়ে যেতে হবে। আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে টাঙ্গায় ওঠে বসলাম। টাংগা ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে ছুটল খট, খট, খট, খট......।

দু’’দিন, দু’’রাত পার হল। পরদিন সকাল ৮ টায় আলমাআতায় পৌঁছলাম। সেখান থেকে সামান্য দক্ষিণে গেলেই জামেউল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়। শহরে লোক চলাচসসবিদ্দালয়। নেই গাড়ী-ঘোড়ার কোলাহল। দু’একটি দোকানপাট খোলা থাকলেও কেনাকাটা তেমন নেই। মাঝে-মধ্যে পুলিশের গাড়ী টহল দিচ্ছে। দু’একটি খণ্ড খণ্ড মিছিল এলপাতারিভাবে শহর প্রদক্ষিণ করছে। সকলের

হাতে কাস্তে-হাতুড়ি খচিত নিশান। তারা শ্লোগানে শ্লোগানে আসমান-জমিন কাঁপিয়ে তুলছে-

দুনিয়ার মজদুর, এক হও, এক হও। কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না। নারী-পুরুষ এক সমান, সাম্যবাদীর শ্লোগান। মৌলবাদ নিপাত যাক, সমাজতন্ত্র দিচ্ছে ডাক। ইসলামকে কবর দাও, কাস্তে-হাতুড়ি হাতে নাও।

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধরণের শ্লোগান দিচ্ছে। সবগুলো এখন মনে নেই। আমার পরনেও নাসারাদের পোশাক। বুকে কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা স্টিকার। হাতে লেলিনের ফটো অংকিত ডাইরি। হঠাৎ কেউ দেখে মৌলবাদী বা রূহানী হিসেবে চিহ্নিত করতে মুশকিল হবে। আমি আস্তে আস্তে জামেউল উলুমের দিকে যাচ্ছি। মাদরাসার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছলে এক পথচারী আমার হাত ধরে বললেন, বাবা! কোত্থেকে এসেছ? লোকটাকে দেখে একটু চেনা চেনা মনে হল। বয়স পঞ্চাশের

কোঠায়। আমি অচেনার ভান করে বললাম, আমার বাসা কারজল কলোনি। পথচারী মুচকি হেঁসে আমার জামা-কাপড়ের দিকে বারবার তাকিয়ে কি যেন আবিস্কার করছেন। তারপর একটু জোর করেই তার বাসায় নিয়ে গেলেন। হাম্মামখানার দরজা খুলে কাপড়, সাবান ও গামছা দিয়ে বললেন, বাব! বহুদূর থেকে এসেছ, গোসল করে খানা খেয়ে বিশ্রাম নাও, আলাপ পরে হবে।

লোকটির ব্যবহারে আমার বুঝতে একটুও বাকি রইলো না যে, তিনি আমাকে চিনেন। আমি মাদরাসায় যেতে চাইলে তিনি নিষেধ করে বললেন, "বিকেলে তোমাকে নিয়ে যাবো। এখন বিশ্রাম কর। আমি নিরুপায় হয়ে গোসল করে খানাপিনা সেরে বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম।

অল্পক্ষণের মধহে নিদ্রা এসে কাবু করে আমাকে অচেতন বানিয়ে দিল। একটানা দু'তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে জেগে দেখি দু'টো বেজে গেছে। ঝটপট ওজু করে যোহরের নামাজ আদায় করে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম।

ঘরওয়ালা খুব শান্ত মেজাজের। মুচকি হাসি তার চিরাচরিত অভ্যাস। আলাপে খুব রসাল। মাদরাসার কথা জানতে চাইলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বাবা! মাদরাসায় গিয়ে কোন লাভ নেই। গত এক সপ্তাহ হল কমিউনিস্টরা রাজধানী আলমাআতায় বসবাসরত আলেম-ওলামাদেরকে মসজিদ-মাদরাসা, খানকা, ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট থেকে ধরে সাইবেরীয় বরফাঞ্চলে নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে বহু সংখ্যক মা-বোনদের। গতকাল সন্ধায় জামেউল উলুমের বেশ ক'জন ছাত্র-শিক্ষক ও আরও কিছু নারী-পুরুষকে নিয়ে গেছে পুর্ব দিকের গ্রামের পরিত্যক্ত এক জমিদার বাড়িতে। সেখানে দিনে দুপুরে মানুষ যেতে ভয় পায়। প্রাচীন আমলের জমিদার বাড়ী এখন বনবনানিতে ভরে গেছে। সাপ, বিচ্ছু আর হিংস হায়েনাদের আবাসভূমি। ওদেরকে নেয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর অনেকগুলো গুলীর শব্দ শুনেছি। মনে হয় ব্রাশ ফায়ারে সবাইকে শহীদ করে দিয়েছে। ওদের সাথে আমার আদরের দুলাল মাদরাসা পড়া ছাত্র তমিজ দুয়ায়েভকেও নিয়ে গেছে। ওদের হালত দেখার মতো

সাহস হারিয়ে ফেলেছি। এই বলে লোকটি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোন ভাষা আমার অন্তরে সঞ্চিত ছিল না। লোকটির কথায় আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, আব্বুকেও ওরা রেখে যায়নি। নিশ্চয় হায়েনারা আমার আব্বুকে শহীদ করে ফেলেছে।

আম্মুর স্বপ্নের ব্যাখ্যা যথার্থই প্রতিফলিত হয়েছে। আমি তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম, এখন কি মাদরাসা বন্ধ? নাকি কেউ আছে? তিনি বললেন, "না, মাদরাসায় এমন কেউ নেই, আছে লাল ফৌজের সদস্যরা। কাউকে ওদিকে যেতে দেয় না। কথাগুলো শোনা মাত্র আমার ধমনীতে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের শোণিতধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠলো। এক অসহনীয় ব্যদনায় কুলহিন পারাবারে সাতার কাটছি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম প্রতিশোধ নেয়ার।

আমি জামেউল উলুমের হেফজ বিভাগে দু'তিন বছর পড়েছি। আশপাশের বাসাবাড়ি, বাড়িঘর, দালানকোঠা, পথঘাট, অলিগলি সবই আমার পরিচিত। পাশের এলাকার গ্রাম্য পথঘাটও অচেনা নয়। চোখ বন্ধ করেও ঘুরে আসতে পারবো কয়েক গাঁ। অনেক বাঁধা-বিপত্তি এড়িয়ে আলমাআতায় এসে পৌঁছেছি। যেভাবেই হোক আব্বুর সঠিক সংবাদ নিতে হবে। তার লাশ খুঁজে বের করতে হবে। মনের সংকল্প মজবুত থেকে মজবুত হতে লাগলো। হতভাগিনী আম্মু সংবাদের অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে আছেন। আব্বুর সংবাদ আম্মুকে পৌঁছে বোখারার দিকে পা বাড়াব। আনোয়ার পাশার মুজাহিদ বাহিনিতে যোগ দিয়ে খোদাদ্রোহীদের চিরতরে নিপাত করতে হবে।

এসব চিন্তার মধ্য দিয়ে এক সময় দিনমণি আঁধারে লুকিয়ে গেল। সারাটি দিবস পার হয়ে গেল, অথচ কোথাও থেকে কোন আজানের ধ্বনি কানে এলো না। এক সময় আলমাআতার মিনারে মিনারে আজান প্রতিধ্বনিত হত। আজ নিরব-নিস্তব্ধ। আমি মাগরিবের

নামাজ ঘরে পরে নিলাম। তারপরে কুরআন তেলাওয়াত করে দেশ-জাতি ও বৃদ্ধা আম্মুর জন্য দোয়া করলাম। দোয়া শেষ করলে গৃহকর্তা ফিরে এলেন এবং আমার অবস্থা জানলেন। অতঃপর শহরের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করলেন।

আমি বললাম চাচা, কিচ্ছুক্ষণ পর আমি আব্বুর খোঁজে ঐ গ্রামে জমিদার বাড়ী যাব। সেখানে আব্বুকে তালশ করে দেখবো, তিনি শহীদ হয়েছেন, না বেঁচে আছেন। যদি শহীদ হয়ে থাকেন, তবে দাফনের ব্যবস্থা করবো।

আমার কথা শুনে তিনি তার চোখ দু'টো কপালে তুলে বললেন, 'বেটা! এতো দুঃসাহস করা ঠিক হবে না। ওখানে দেও-দানবের আস্তানা। অনেক কাঠুরিয়া সেখানে ভয়ে প্রাণ হারিয়েছে। দিনে-দুপুরেও এর আশপাশে মানুষ যায় না। পার্শেই রয়েছে শ্মশান। তাছাড়া রাতটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। একা একা ওখানে যাওয়া আমি ঠিক মনে করিনা।

চাচার কথাগুলো আমার কাছে তিক্ত মনে হচ্ছিল। আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম, দুনিয়া থেকে একদিন না একদিন বিদায় নিতেই হবে। মউত থেকে পাশ কেটে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আপনার দোয়া ও অনুমতি কামনা করি।

এসব আলাপ-আলোচনার মধ্যে এশার সময় হয়ে গেলো। দু;জনে নামাজ পড়ে নিলাম। নামাজ শেষে তিনি অন্তর বাড়িতে চলে গেলেন। একটু পরে খানাসহ এসে বললেন, চল বেটা খানা খেয়ে নেই। এক সাথে দু'জনে খানা খেলাম। তিনি নিজ হাতে খানা পরিবেশন করলেন। আহার সেরে নাছারাদের পোশাক পরিধান করলাম। চাচাকে ডেকে বললাম, আমার জন্য খাছ করে দোয়া করবেন। অনেক তকলিফ দিয়েছি, ক্ষমা করবেন। চাচা চোখের পানি মুছে বললেন, বাবা! যেখানেই যাও, যা কিছু কর, সংবাদ দিও। আবার ফিরে এসো, এটা তোমার বাড়ী, কোন সংকোচ মনে কর না। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে। তোমার আব্বার সাথে ছিল আমার অকৃত্রিম

ভালোবাসা। তুমি হয়তো চিননা। তুমি আমার ছেলে তুল্য। এসব উপদেশ দিয়ে তিনি আমাকে দোয়া করে বিদায় দিলেন। আমি আঁধারে মিলিয়ে গেলাম।

রাত আনুমানিক ১০ টা। লোক চলাচল ক্রমশই কমে আসছে। চলছি একা অজানার সন্ধানে। শহরের প্রধান সড়ক ছেড়ে দক্ষিণের কাঁচা পথ ধরে চলছি। প্রায় এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বা দিকে চলে গেছে পায়ে চলা মেঠো পথ। এ পথেই পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ী যাওয়া সহজ। মাঝে মধ্যে দু'একটি বাড়ী থাকলেও লোকজন ঘুমের ঘোরে অচেতন। হঠাৎ হঠাৎ খেকশিয়ালের হুক্কা হুয়া আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আবার কোথাও কোথাও কুকুরের কর্কশ বকুনি রাতের নীরবতা ভঙ্গ করছে। দূর আকশে দু'একটি তারা মিটমিট জ্বলছে। মনে হচ্ছিলো, কালো চাদরে রাত্রিটা যেন আবৃত। দু হাত দূরে কোন কিছু দেখার সাধ্য নেই। আমি বিড়ালের মতো পা ফেলে সামনে এগিয়ে চললাম। হরিণের মতো সাবধানতা সিংহের মতো বাহাদুরি নিয়ে চলছি।

আমার একমাত্র সফরসঙ্গী আল্লাহ। কখনো কখনো কলাবাদুরের ডানার পত্ পত্ শব্দে ছাতি দুরু দুরু কাঁপছে। পা সামনে এগুতে চায়না। আবার দূর থেকে ভুতুম! ভুতুম ভয়ানক আওয়াজ ভেসে আসছে। শিশুকালে এ আওয়াজ শুনে মায়ের আচলে লুকাতাম। আহ! কি ভয়ংকর আওয়াজ। এসব ভয়-ভীতির পাহাড় ডিঙ্গিয়ে অনেক দূর অতিক্রম করেছি। পল্লী এলাকা প্রায় শেষ। আর অল্প কিছু পথ সামনে এগুলেই সেই অরণ্যভুমি, যেখানে প্রাচীন আমলের জালিম রাজার রাজপ্রাসাদ। আশাপাশে বাড়ী-ঘর নেই, নেই কোন জনপদ। আল্লাহ্র আজাবে অত্যাচারী রাজা বংশধরসহ ধ্বংস হয়ে গেছে শত বছর আগে। এখন আছে শুধু লাল ইটের দালান-কোঠার ধ্বংসাবশেষ।

যুগ যুগ ধরে সে স্মৃতি বহন করে চলেছি এলাকাটি। বিশাল বিশাল কক্ষ, তার ভিতরে যেন অমানিশার অন্ধকার। সে সমস্ত দালান-কোঠার অভ্যন্তরে রয়েছে নানা প্রজাতির কাঁটাযুক্ত গাছ-গাছালি। আবার ছাদে ছাদে

রয়েছে অসংখ বট বৃক্ষ ও পাকুড় গাছ। দূর থেকে তাকালে মনে হয় এ যেন ঘন জঙ্গল। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে নিকটে চলে আসলাম। তারপর খুব সতর্কতার সাথে আব্বুর মৃত দেহ তালাশ করতে লাগলাম।

হঠাত ভেসে আসলো মানুষের কণ্ঠস্বর। হৃদপিণ্ড কেঁপে ওঠলো। পা থেমে গেলো। এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। সত্যিই কি তা মানুষের আওয়াজ? নাকি ভুত-পিচাশের আওয়াজ! কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। হঠাৎ অস্পষ্ট স্বরে আল্লাহম আল্লাহ, বাঁচাও, বাঁচাও, রক্ষা কর, এসব আওয়াজ শুনতে পেলাম। এতক্ষণে আমার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, নিশ্চয় এটা মানুষের কণ্ঠস্বর। হয়তো কোন বন্দী বা বন্দিনীর কণ্ঠ থেকে তা ভেসে আসছে।

আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললাম। ঘন অন্ধকারে বৃক্ষের সাথে রজ্জুতে বাঁধা এক হতভাগা। আমি তার নিকটে গেলে সে করুন সুরে আরজ করল, স্যার!

আমাকে ব্রাশ ফায়ারে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিন। এ কষ্ট আর সইতে পাড়ছি না। খুব ছোট আওয়াজ, নরম সুর। শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি শুনে লোকটি আমাকে সৈন্য মনে করেছে। তাই বন্ধনের কষ্ট সইতে পারছে না বিধায় ফায়ার করে হত্যা করতে অনুরোধ করছে।

আমি লোকটির নিকটে গিয়ে বন্ধন খুলে দিয়ে বললাম, ভাই, আমি সৈন্য নই। আমি একজন মুসলমান। আব্বুর খোঁজে এসেছি। বন্দী বন্ধন মুক্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন। শক্ত করে বাঁধার কারণে রক্ত চলাচল বন্ধ ছিল। আমি আলতোভাবে তার বন্ধনের স্থানগুলোতে হাত বুলিয়ে দিলাম। তারপর ব্যাগ থেকে কিছু কিসমিস বের করে খেতে দিলাম। তিনি কিসমিস খেয়ে পানি পান করে জঠর জ্বালা কিছুটা নিবারন করলেন।

আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি কান্না সংবরণ করে বললেন, 'বাবা! আমার নাম রাসুল খান বুলন্দি। আমি জামেউল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের সানি মুহাদ্দিস।'

এতটুকু শুনেই আমি তাকে চিনে ফেললাম। তিনি আমার মুহতারাম উস্তাদ। প্রায় পনের পারা কুরআন শরিফ তার নিকট মুখস্ত করেছি। আমিও তার নিকট আমার পরিচয় দিলাম। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অশ্রুবরণ করে বুকের আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেন। হৃদয়ের ব্যথা চেপে রেখে বললেন, 'বাবা! তুমি যে সুদূর জামবুল থেকে অনেক কষ্ট করে ছুটে আসলে এ বিজন বনে আমাকে মুক্ত করতে! সত্যিই তুমি আল্লাহ্র ওলী।'

হুজুরের কাছে আব্বুর সংবাদ জানতে চাইলে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'বাবা! তোমার আব্বাকে জনমের মতো হারিয়েছ। তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি বিশ্ববাসীকে ছেড়ে জান্নাতে চলে গেছেন। গতকাল

শতাধিক আলেম ও তালেবে এলেমকে অধিকের নির্জন কক্ষে নির্মমভাবে শহীদ করে দিয়েছে কম্যুনিস্ট হায়েনারা।'

আব্বুর সংবাদ শোনামাত্র আমার মনে হল মাথায় বজ্র পতিত হয়েছে। কে যেন আমার অজান্তে বিষমাখা তীর নিক্ষেপ করে আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিয়েছে। আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। বাক্রুদ্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ ভূতলে ছটফট করলাম। দুনিয়াটা অসাড়, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। কালবৈশাখের ছোবল যেন উড়িয়ে নিয়ে গেছে আমার জীবনের সব আশা-ভরসা। বন্ধনহীন অপ্রতিরোধ্য প্লাবনের ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে অশ্রুধারা। এ অবস্থায় অতিবাহিত হল তিমিরাচ্ছন্ন রজনীর এক -দেড় ঘণ্টা। আমার মোহতারাম উস্তাদ রাসুল খান বুলন্দি তিনি সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। তবু অনেক খুঁজাখুঁজির পর পবিত্র কুরআন থেকে ধার করে নিয়ে এলেন সান্ত্বনার বাণী-'ছবরকারীদের সাথে আল্লাহ থাকেন।'

হুজুরের মুখে এতটুকু শুনে আমি নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর হুজুর কে পুরু ঘটনা বলার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বললেন, বাবা! আমাদেরকে মেষ পালকের ন্যায় হাকিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়। ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও বেশ কিছু সাধারণ নারী-পুরুষ ছিল। আমি মুক্তির পথ খুজছিলাম। এক পর্যায়ে রাস্তার পাশে বসে পড়ি। সবাই আগে আগে চলছে। আমার পিছনে যে সৈন্য আছে, তা জানতাম না। সে সৈন্যের নজর এড়ানো সম্ভব হয়নি। সৈন্যরা আমার হাত-পা বেঁধে ফেলে। তারপর গাছে সাথে মজবুত রশিতে বেঁধে ফায়ার করে। ভাগ্যক্রমে আমার শরীরে ফায়ার লাগেনি। আল্লাহ হেফাযত করেছেন। কিছুক্ষণ পর একসাথে গর্জে উঠল থ্রি-নট-থ্রিম স্টেনগান, এসএলআর ও ক্লাশিনকভ। ব্রাশফায়ারের প্রলয়ংকারী আওয়াজ জমিন কাঁপিয়ে তুলেছে। মনে হল, অরণ্যের কোন প্রাণী এ এলাকাতে নেই। ধারণা হল, কেউ আর বেঁচে নেই। নরপশুরা ওদেরকে হত্যা করে কিছু লাশ বিবস্ত্র করে, কাপড়গুলো

নরপশুরা পুড়িয়ে ফেলল। এ অন্ধকারে বড় হুজুরের লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে মন হয়।’

আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি একা বাসায় যেতে পারবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারবো।’

আমি বললাম, হুজুর! রাত প্রায় শেষ, জলদি এ স্থান ত্যাগ করা দরকার। কে জানে আবার কোন বিপদ এসে হাজির হয়। তিনি বললেন, “তুমি একা এখানে থেকে কি করবে? তুমিও সাথে চল।” আমি বললাম, হুজুর! উভয়ে এক পথে না ভিন্ন পথে যাব। হুজুর চলে গেলেন।

রাত আনুমানিক তিনটা। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আমি আস্তে আস্তে শহীদদের লাশ দেখতে অগ্রসর হলাম। সামনে একটু অগ্রসর হয়েই অনুভব করলাম, মৃদুমন্দ অনিল হিল্লোল সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছে এক জান্নাতি খুশবো। এমন মনোমুগ্ধকর পাগল পারা ঘ্রাণ দুনিয়ার কোন নাসিকা কোনদিন গ্রহণ করেনি। আমার

হৃদয় সাক্ষ্য দিল, এ নিশ্চয় শহীদের রক্তের সুঘ্রাণ। কামরার নিকট গিয়ে দেখি, লাশগুলো মুক্তার মতো ঝলমল করছে।

লাশগুলো এতো গাদাগাদি অবস্থায় পড়ে আছে যে, কোনটা কার লাশ, তা শনাক্ত করা মুশকিল। অনেকগুলো লাশ ব্রাশ ফায়ারে ক্ষতবিক্ষত। একা একা টানাটানি করে আব্বুর লাশ উদ্ধার করা অসম্ভব। তাই লাশগুলো সামনে নিয়ে জানাজা পড়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আব্বুর জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে বেড়িয়ে আসলো- 'আব্বু, ও আমার আব্বু! তোমার পাগল ছেলে তোমার খোঁজে এসেছে।' আহ! কেউ আমার ডাকে সাড়া দিলো না। তিনি আর ধূলির ধরায় নেই।

রাত বেশি নেই আমার অরণ্যে রোদন কে শুনবে? কিছুক্ষণ পরেই ভোরের রবি সমস্ত আঁধার নাশিয়ে পুর্বাকাশ রাঙ্গিয়ে উদিত হবে। সেনাবাহিনী আবার আসতে

পারে। কোন বিপদ ঘটে যায় কে জানে। তাই এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার চিন্তা করছি।

হঠাৎ শুনতে পেলাম উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে লাশের স্তূপের ভেতর থেকে ক্ষীণস্বরে কে যেন 'আল্লাহ আল্লাহ' জিকির করছে। আমি অত্যন্ত কৌতূহলে ভয়ে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম লাশের স্তুপের পাশ দিয়ে। অনেক কষ্ট করে বেশ কটি লাশ টেনে সরালাম। তারপর আরও একটি লাশ সরানোর চেষ্টা করলে একটু ঝাকুনি লাগলো। আমি বুঝতে পারলাম, এ লোকটি গুরুতর আহত এবং জীবিত। আমি তাকে কক্ষের বাইরে নিয়ে এলাম। হাত-পায়ের বন্ধন খুলে দিলাম। তারপর একটু নড়াচড়া করতেই উহ আহ শব্দ করলো। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ভাই, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি তোমার উদ্ধারকারী, তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি। এখন আর তোমার কোন ভয় নেই। জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, তোমার শরীরে কোন গুলি লেগেছে কি?সে মাথা নেড়ে জানাল, কোন গুলি তাকে আঘাত করেনি। দু;তিন দিনের

অনাহারে লোকটির শরীর দুর্বল। আমি কিসমিস আর পানি বের করে দিলাম। লোকটি বেশ কয়েক মুঠো কিসমিস খেয়ে পানি পান করলো। আমি তাকে আরও একটু দূরে নিয়ে গেলাম। একটি বৃক্ষের নিচে বসিয়ে উভয় দিলাম। এখন অনেকটা শান্ত ও সুস্থ। একটু একটু করে হাঁটতে সক্ষম। লোকটি আমাকে খুব দোয়া করতে লাগলো এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলো।

লোকটি মৃদু স্বরে বলল, ভাই আপনাকে আরও একটু কষ্ট করতে হবে। আশা করি মনে দুঃখ নিবেন না। কাজটি হল, ওখানে দরজার নিকট দুটি সৈন্যের লাশ পড়ে আছে। তাদের নিকট রয়েছে অত্যাধুনিক দুটি হাতিয়ার ও গোলাবারুদ। রয়েছে গ্রেনেড, মাইন, পিক্রু, বেল্ট, জুতা, লাইনার, বাঁশি ও জামা-কাপড়। ওসব মালামাল এক্ষুনি নিয়ে আসুন। এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগবে।

আমি লোকটির কথায় এগিয়ে গেলাম। তারপর সমস্ত মালামাল নিয়ে এলাম। খুলে নিয়ে এলাম লাশগুলোর

পড়নের কাপড়-চোপড়ও। লোকটি বলল, ভাইজান! এখানে দেরি করা বিপদজনক। ভোর হয়ে গেছে। চলুন, অন্ধকার কাটার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাই। কোথায় যাবো, কোথায় নিরাপদ আশ্রয় পাবো তা নিয়ে দুজনে শলাপরামর্শ করলাম। লোকটি বলল, অবস্থায় লোকালয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। চলুন, আমরা গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেই। বনের হিংস্র জানোয়াররা আমাদের শত্রু নয়, আমাদের শত্রু হল আশরাফুল মাখলুকাত-মানুষ। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম।

তিনি আমাকে আরও জানালেন , ভাইজান! আপনি আমাকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন, আল্লাহ আপনাকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমি আমার বংশে একা। পরিবার-পরিজনকে কমিউনিস্ট হায়েনারা শহীদ করেছেন দিয়েছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার সংসারে আর কেউ জীবিত নেই। দুনিয়াতে থাকতে হলে, দ্বীন নিয়ে, ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। অন্যথায় আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করতে চাই। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই না। তিনি আরও বললেন, এ বনের দক্ষিণে ছোট্ট একটি নদী আছে। চলুন আমরা নদীর তীরে ঘন জঙ্গলের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিই। সময় সুযোগে যে কোন দিক যেতে পারবো।

আমি তার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলাম । সমমনা একজন সাথী পাওয়া খুবই কষ্টকর। লোকটির পরামর্শ কতইনা চমৎকার। তাকে সাথে রাখতে বাঁধা কিসের? এসব ভেবে চিন্তে ছামানাগুলো কাঁধে তুলে নিলাম। তারপরে লোকটির হাত ধরে দুজনে নদীর দিকে এগিয়ে চললাম। কিছু রাস্তা অতিক্রম করতে সুমধুর কল কল ধ্বনি শুনতে পেলাম। নদী অতি নিকটে। নদীর কুলে ঘন বন, সেখানে লোকজনের যাতায়াত নেই। নীরব-নিস্তব্ধ। মাঝেমদ্ধে নির্জনতা ভেংগে বনের পশুগুলো তর্জন-গর্জন করে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করে আর দলে দলে নদীতে পানি পান করতে আসে। একদিকে নরপশুর চেয়ে বন্য পশু ভালো। কারণ, ওরা জঠর জ্বালা নিবারন করতে অন্য

পশুর উপর আক্রমণ করে বসে। আর মানবরুপী পশুরা হিনমনোবৃত্তি চরিতার্থ করার নিমিত্তে অন্য মানুষের উপর আক্রমন করে। প্রভুত্বপ্রিয়তা মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র দাসত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। রব কে ভুলে গিয়ে নিজেই ঘোষণা করে, আন্না রাব্বুকুমুল আলা। কাজেই এসমস্ত নরপশুদের চেয়ে বন্য পশুরা সহস্র গুণে উত্তম। তাই বন্য হায়েনাদের ডর-ভয় দিল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ওরা যে আমাদের পড়শি, ওরা যে আমাদের বিপদের দিনের সাথী, তা কবুল করে নিয়েছি। তারপর একটি স্থান নির্বাচন করে ওখানে ছামানাপত্র রেখে দিলাম।

ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ওজু-এস্তেঞ্জা সেরে দু'রাকাত সুন্নত পড়ে জামাতের জন্য বসে রইলাম। লোকটি বলল, ভাইজান! আমার একটু বিলম্ব হবে। আপনি নামাজ সেরে বিশ্রাম নিন। সারারাত তো ঘুমাতে পারেননি। আমি ওর জন্য অপেক্ষা না করে নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আমি একটানা তিন-চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে জাগ্রত হয়ে দেখি,

সৈনিকদের রক্তমাখা পোশাক গাছের ডালে ঝুলছে। লোকটি নদীর পানিতে ওগুলো ধৌত করে শুকাতে দিয়ে নিজে একটু দূরে একটি গাছের নিচে ঘুমে অচেতন। আমি তার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানার জন্য নিকটে গেলাম। গিয়ে দেখি, এ তো মানুষ নয়, পুরুষও নয়। এ যেন জান্নাত থেকে পালিয়ে আসা হুর। বৃক্ষের ফাক দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে তার চেহারায় পড়েছে। এতে যেন তার চেহারার কমনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ও যেন একটি ফুটন্ত কুসুম। কাল কেশদাম কটি দেশ পর্যন্ত বিছিয়ে রয়েছে। নাসিকাটা যেন কোন সুদক্ষ কারিগর নিপুণ হাতে তৈরি করেছে। আখিযুগল যেন বনের চঞ্চলা হরিণী থেকে চুরি করে সংগ্রহ করেছে। আঙ্গুলের মাথাগুলো যেন আঙুরের থোকা। সুঠাম গড়ন, উন্নত বক্ষদেশ। এ যেন ইউসুফের জুলায়খা, মজনুর লায়লা, ফরহাদের শিরি।

দীর্ঘক্ষণ অপলক নেত্রে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবনার সাগরে হারিয়ে গেলাম। লাবণ্যময় চেহারাটা যেন

চেনা চেনা মনে হয়। সে যেন আমার খুব কাছের মানুষ। আসলে কিন্তু পুরুটা চিনতে পাড়ছি না। না, আসলে সে মানুষ নয়, মানবরুপী ফেরেশতা, না হয় রূপসী পরী। এখানে কেন তার আগমন? কে নিয়ে এলো ওকে বেহেশতের দুয়ার খুলে?

এই তরুণীকে দেখলে মহান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়, যিনি তাকে এতো সুষমামণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কত সুন্দর! যার সৃষ্টি এতো মনোলোভা, এতো সুন্দর, তার সৌন্দর্যের কি তুলনা হয়! পার্শ্বে বসে আমি এসব চিন্তায় বিভোর। হঠাৎ পার্শ্ব পরিবর্তন করে সে বামদিক থেকে ডানদিকে ঘুরল। এমন সময় ডাগর দুটি আঁখি খুলে সে আমার দিকে তাকাল। তাকিয়েই চিৎকার করে বলে ওঠল, “ইয়া...।। তুমি খোয়ায়েব জামবুলী! খোয়ায়েব ভাইয়া! তুমি যে এখানে? কোত্থেকে এলে এ বিজন বনে? তুমি কি মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছ? তুমি কি তোমার অসহায়া বোনটিকে জালিমের হাত থেকে মুক্ত করতে ছুটে এসেছ? আল্লাহ কি তোমাকে প্রেরণ করেছেন

মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে? তুমি এসেছ দ্বীনকে রক্ষা করতে? বললে না ভাইয়া, তুমি কোথা থেকে এলে?

এবার আমি সুন্দরীকে আবিষ্কার করেছি, সে যে আমার হেফজ জীবনের সাথী। দু'তিন বছর আমরা একই সাথে আলমাআতা জামেউল উলুমে হেফজ বিভাগে পড়াশোনা করেছি। নাম ছায়েমা মালাকানী। নাজেরার বছর ওদের বাসায় জায়গীর ছিলাম। ওর আব্বা একজন দ্বীনদার, পরহেজগার লোক। বড় আলেম না হলেও শরীয়তের জরুরী মাসআলা-মাসায়েলে খুবই পাকা ছিলেন। গ্রামের একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন তিনি। ছায়েমা আমার চেয়ে বয়সে দু'এক বছরের ছোট হবে। বর্তমানে আমার বয়স আঠার। ছায়েমার ষোল কি সতের হবে। ওর সাথে দেখা নেই প্রায় দশ-এগার বছর হবে। তাই প্রথমে চিনতে একটু কষ্ট হয়েছে। সে তার আব্বা-আম্মা ও ভাই-বোনের শাহাদাতের করুন কাহিনী আমাকে শোনাল। আমিও তাকে আব্বুর মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক

শাহাদাতের খবর, দেশের অবস্থা এবং নিজের ইতিহাস শোনালাম।

ছায়েমা মালাকানী আমাকে অনুনয়-বিনয় করে বলতে লাগলো, “ভাই খোয়ায়েব! তুমি আমাকে একা ছেড়ে কোথাও চলে যেও না। আমার মাথা গোঁজার ঠাই নেই। তুমিই তো আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে এনেছ। আমার দুনিয়াতে আর কোন আশা বাকি নেই। দুনিয়ার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-সাধ আমার ধুলায় মিশে গেছে। এখন ইসলামের জন্য জিহাদ করেই জীবনের যবনিকা টানতে চাই। তাই শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে রক্তমাখা ভূষণে আল্লাহ্‌র সমীপে হাজির হতে। আমি চাই, আমার তাজা খুনে ইসলামের কালেমাখচিত ঝাণ্ডা তামাম জাহানে উড্ডীন করতে। আমি চাই, হযরত ছুমাইয়া রাঃ এর মতো শাহাদাতবরন করতে। আমি চাই, ইসলামের দুশমনদের দুনিয়ার বুক থেকে জাহান্নামে নির্বাসন দিতে। তামাম তাগুতি শক্তিকে পদানত করে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। আমি চাই, গোটা মুসলিম বিশ্বের

বিজয় ছিনিয়ে এনে মজলুম মানবতার মুক্তি দিতে। নির্যাতিত-নিপীড়িত মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে। আমি চাই, এতিম, বিধবা, পঙ্গু, অনাথ-অনাথিনীর মলিন মুখে হাসি ফুটাতে। আমি চাই, কাফের-বেঈমানদের বন্দীশালারা লৌহ কপাট চুর্ন করে সকল বন্দী-বন্দিনীকে উদ্ধার করে তাদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দিতে। আমি চাই, সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদের পরিবর্তে আনন্দের হাসি দেখতে। আমি চাই, দুঃখী ও অসহায় মানুষের চোখের পানি মুছে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে।” বীরঙ্গনা ছায়েমা মালাকানী তেজোদীপ্ত কণ্ঠে তার অভিপ্রায়গুলো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ননা করছিল। আমি তার বর্ণনাভঙ্গি ও ঈমানী জজবা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। মনে হল, আমি নবজীবনের সন্ধান পেয়েছি। আমার চির ঘুমন্ত প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে ছায়েমা। সুপ্ত ঈমানে শাণ দেয়ার মতো অসাধারণ যোগ্যতা তার মাঝে লুকিয়ে আছে, যা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। ওর কথাগুলো সত্যিই যাদু-মন্ত্রের ন্যায় চমকপ্রদ। এমন সাহস দানকারী তরুণী

সমাজে খুঁজে পাওয়া এতো সহজ নয়। তার জ্ঞান-গরিমা, ও বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আমি বিস্মিত।

আমি ভাবছিলাম, এ কি সেই ছায়েমা, যার সাথে আমি শৈশবে খেলা করেছি! একি সেই খুকী, যার সাথে দু'তিনটি বছর পবিত্র কুরআন শরিফ হেফয করেছি। যার সাথে প্রায়ই ছবক নিয়ে প্রতিযোগিতা হত। একি সেই ছায়েমা, যে সুরেলা কণ্ঠে হামদ, নাত, তারানাম গজল, কাছিদা, কবিতা আবৃত্তি ও কেরাত পাঠ করে প্রথম প্রাইজগুলো নিয়ে নিত। যার সুর লহরীতে ভাবুক নিজেকে হারিয়ে ফেলত, সে কি আজ জিহাদের দুর্গম পথে, খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল পথে অগ্রণীর ভুমিকা পালন করতে বজ্রশপথ নিয়েছে? এই কিশোরীর জিহাদের স্পৃহার কথা শুনে বিস্মিত হবে না, এমন কে আছে!

এসব চিন্তা করতে করতে উঁচু বৃক্ষের মাথার উপরের সুর্যটা কখন যে ঢলে পড়েছে, তা টেরও পাইনি। হঠাৎ ছায়েমা আমাকে বলল, "ভাইয়া! যোহরের সময় হয়ে

গেছে; গোছল সেরে নামাজ পড়ে নিন। আমি গোসলের জন্য নদীতে চলে গেলাম। গোছল সেরে কাপড় পালটিয়ে দু'চার কদম সামনে অগ্রসর হতেই আমার শরীর শিউরে উঠল। চেয়ে দেখি, একটু দূরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক সৈনিক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি প্রায় সংজ্ঞাহীন, কিংকর্তব্যবিমুঢ়। জীবন নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি। তাই জীবন বাজী রেখে উর্ধশ্বাসে দিলাম এক দৌড়।

হঠাৎ ছায়েমার কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো আমার কানে, "খোয়ায়েব ভাইয়া! খোয়ায়েব ভাইয়া! তুমি কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ, তুমি আমাকে একা ফেলে এ বিজন বনে? অমন করে পালাচ্ছ কেন? ফিরে আস। আমায় একা ফেলে যেও না।" আমি ভয়ে ভয়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, সৈন্যটি আমাকে অনুসরণ করছে। আমার দিকে দৌড়ে আসছে। আমি আরো জ্বরে পাগলা ঘোড়ার মতো প্রাণপণে ছুটছি। ঘনজঙ্গলের অন্তঃপুরে এক ঝোপের অভ্যন্তরে মিছামিছি আশ্রয় নিয়েছি। কর্মকারের

তাদানির মতো আমার পেট উঠানামা করছে। আর নাসিকার ছিদ্র পথে হাজার মেইল বেগে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে। কেউ দেখলে হয়তো মনে করতো সাইমুম আরম্ভ হয়েছে। হাত-পা অবশ, শুকরিয়া, অল্পতে বেঁচে গেছি। মনে মনে ভাবছি, এতদূর হয়তো ধাওয়া করবে না। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল, আমার অসহায়া বন হাফেযা ছায়েমা মালাকানীর কথা। হায়! দুশমনের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে মেয়েটাকে আবার বুঝি হায়েনার মুখের কাছে ছেড়ে এসেছি। হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর। ছায়েমা আমার অবলা-অসহায় মজলুম বোন। তুমি ছায়েমাকে হেফাযত কর। আমি তোমার কুদরতি হাতে তাকে সোপর্দ করলাম। তুমি আমাকে হেফাজত কর।

একটু পরেই শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি কানে আসল। শরীর শিউরে উঠল। আবার ছাতি কাঁপা আরম্ভ হল। তাহলে কি সৈন্যটি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? নড়াচড়া বিলকুল বন্ধ। হঠাৎ দেখি, রণসাজে সুসজ্জিত হয়ে সেনা

জওয়ানটি ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষের উপরিভাগে তাকাচ্ছে, আবার বসে বসে নিচে কি যেন খুঁজছে। আমাকেই যে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করতে লাগলাম-অজাআলনা বাইনা আইদিহিম ছাদ্দাও পমিন খালফিহিম ছাদ্দাও ফাআগশাইনাহুম ফাহুম লা ইবছিরুন। আল্লাহুম মাকফিনাহু বিমা শিতা, আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম, অনাউজুবিকা মিন সুরুরিহিম।"

পেছনে চেয়ে দেখি গ্রীবা নেড়ে নেড়ে এক অভিনব ভঙ্গিতে এক সৈনিক ফিল্ড মার্শালের মতো, বীর বাহাদুর জেনারেলের মতো ঘুরে ঘুরে আমাকে তালাশ করছে। এবার আর রক্ষা নেই। এবার একদম নিকটে। আমি চোখ বুজে মৃত লাশের মতো পড়ে আছি। চেয়ে দেখে বসে বসে সে তালশ করছে। হঠাৎ সে আমাকে আবিষ্কার করে ফেলল।।

অসমাপ্ত

তথ্যসূত্রঃ

shshailani.wordpress.com